ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 509-522
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.038

‘একা এবং কয়েকজন’: তরুণ কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর

ড. শেখ নজরুল ইসলাম, *সহকারী অধ্যাপক, আকুই কমলাবালা উইমেন্স কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 31.12.2024; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sunil Gangopadhyay's first poetry collection is 'Eka Ebong Koyekjon' (Alone and a few). It was published in 1958. The publisher of the book was poet Sameer Roychowdhury. The cover was by Purnendu Patri. There are forty-eight poems in this collection. The poems in 'Eka Ebong Koyekjon' show the young poet's irresistible urge to find his own voice. In the pursuit of this urge, he is trying his best to reach a different path in a light that is gradually independent of his contemporary poets. The reader is surprised by the way he breaks all kinds of conventional thoughts and consciousness and dedicates himself to a new literary experiment. The poet does not want to accept submission anywhere; in fact, he seems to have no bonds anywhere! He wants to go beyond the boundaries and give language to the newly emerging consciousness in the poems of 'Eka Ebong Koyekjon'.

From the poems in the 'Eka Ebong Koyekjon', we get a glimpse of one of the foremost poets of Bengal after Jibanananda. The poems in this book are coherent in theme, beautiful in imagery, and enjoyable to read.

We have found numerous confessions from Sunil about his own poetry – “I am extremely hesitant about my own poetry. I have not yet reached the level of perfection at which a poem becomes complete or, one might say, transcendental.” Yet Sunil had the intention of transcending poetry to that level. His efforts are evident in the poems of his 'Eka Ebong Koyekjon' collection. The foundation of Sunil’s sacrifice for ‘words’, which we have seen throughout his life’s poetic practice, is laid in this collection. As a result, a strange intoxication pervades the body of the poems in this collection. There is also a sense of intoxication.

Keywords: Eka Ebong Koyekjon, Voice, Consciousness, Intoxication, Perfection, Sacrifice, Independent, Boundaries, Transcendental.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। বইটির প্রকাশক ছিলেন কবি সমীর রায়চৌধুরী। প্রচ্ছদ করেন পূর্ণেন্দু পত্রী। এই কাব্যে মোট কবিতার সংখ্যা আটচল্লিশ।

'একা এবং কয়েকজন' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় দেখা যায়, একজন তরুণ কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর খোঁজার অসম্ভব তাগিদ। যে তাগিদের তাড়নায় তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে ক্রমশ স্বাতন্ত্র আলোক-বর্তিকায় ভিন্ন মার্গে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যতরকমের প্রথাগত চিন্তা-চেতনা সব কিছুকে ভেঙে এক নতুন খেলায় আত্মনিয়োগ পাঠককে এখানে বিস্মিত করে। কোথাও কবি বশ্যতা স্বীকার করতে চান না; বস্তুত কোনো খানেই যেন তাঁর বন্ধন নেই! সীমানার বাইরে বের হয়ে নব উত্থিত চেতনাকে তিনি ভাষারূপ দিতে চেয়েছেন 'একা এবং কয়েকজন' কাব্যের কবিতার মাঝে।

'একা এবং কয়েকজন' কাব্যের কবিতাগুলি থেকে আমরা জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলার প্রথম সারির অন্যতম কবিকে পাওয়ার আভাস পেতে থাকি। এই কাব্যের কবিতাগুলি সংহত, সুন্দর, এবং সুখপাঠ্য। যদিও এই সময়ের কবিরাও (পঞ্চাশের দশকের) রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেননি। লিরিকের প্রভাবও পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একা এবং কয়েকজন' কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় অন্ত্য মিল রয়েছে। একদম শুরুর দিকে লেখা কবিতা। তখন সেই সময়ের কবিদের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশি ছিল। সে সময়ের কবিতা ছিল লিরিকধর্মী – গানের মতো কবিতা লেখা হত। একটা আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়াটা ছিল স্বাভাবিক।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকারও করেন তা। এই ধরনের স্বীকারোক্তি সুনীলের পক্ষেই সম্ভব! তিনি নিজের দুর্বলতা, স্ব-চরিত্রের অত্যন্ত গোপনীয়তা ইত্যাদি নানা লোক-নিন্দিত বিষয় প্রকাশ্যে আনতে পারেন অবলীলায়। সরস্বতীর মূর্তি দেখে নিজের যৌন-চেতনা জাগ্রত হবার কথা সুনীলই তো আমাদের শুনিয়েছিলেন তাঁর 'অর্ধেক জীবন' বইয়ের পাতায় –

> "প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় সর্বাঙ্গে শিহরণ হল। কী অপূর্ব সুন্দর মুখ এই শ্বেতবসনা রমণীর! আয়তচক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠ, ভরাট, বর্তুল দুটি স্তন। সরু কোমর, প্রশস্ত ঊরুদ্বয়। ...তার অভিঘাতে তছনছ হয়ে যেতে লাগল আমার কৈশোর, জেগে উঠল পুরুষার্থ, অল্প অল্প শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল শরীর। ...চোরের মতন সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি হাত রাখলাম দেবী মূর্তির বুকে। ...সেই কুচযুগে আমার আঙুল, আমার শরীর আরও রোমাঞ্চিত হল, কানদুটিতে আগুনের আঁচ। আমি প্রতিমার ওষ্ঠ চুম্বন করলাম, আমার জীবনের প্রথম চুম্বন।"[১]

পরবর্তী পর্যায়ে এই স্বীকারোক্তিই হয়ে ওঠে সুনীলের সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য। সুনীলের এই স্বীকারোক্তি কিন্তু কোনো ভাবেই তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের মৌলিক সংশোধনের প্রয়াস বলা যাবে না। তবে এর মধ্য দিয়েই তিনি 'এক আমি' থেকে 'অপর আমি'র উত্তরণের সন্ধান করেন। এই 'এক আমি' থেকে 'অপর আমি'র সত্তার সম্বন্ধ দ্বিমাত্রিক; কখনো তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কখনো তা বৈপরীত্যে বিচ্ছিন্ন। এ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রণজিৎ গুহ অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি কথা বলেছেন –

> "অনেকের রচনাতেই কবিসত্তার এই দ্বিধাবিভক্ত রূপ কিছুটা প্রচ্ছন্ন থাকে। বস্তুত, সেই প্রচ্ছন্নতা ও তার ব্যঞ্জনা সাধারণত এই কবিদের কৃতিত্ব বলেই বিবেচিত হয়। এদিক থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একেবারেই অন্য জাতের কবি। তাঁর কাব্যে, স্বচ্ছতার দাবিতে, স্বীকারোক্তির মধ্যে কোনো ফাঁক

বা ফাঁকি নেই। বরং এই চিড়-খাওয়া অস্তিত্ব যে তাঁর কবিসত্তার মৌলিক উপাদান, সেকথা অসংকোচে কবুল না করলেই যেন তাঁর অস্বস্তি লাগে। তাঁর অস্তিত্ব ঐতরিকতায় আক্রান্ত এবং মরিয়া হয়ে তার অভাববোধের প্রতিকার খোঁজ ফাটল-ধরা আমির দুই খন্ডের পারস্পরিকতায়।"[২]

নিজের কবিতা নিয়েও সুনীলের অসংখ্য স্বীকারোক্তি আমরা পেয়েছি –

"নিজের কবিতা সম্পর্কে আমার সঙ্কোচ দুর্মর। যে পরিপূর্ণতায় পৌঁছালে একটি কবিতা স্বয়ং সম্পূর্ণ কিংবা বলা যায়, অতিজীবিত হয়ে ওঠে, সেই স্তরে আমি আজও পৌঁছোতে পারি নি।"[৩]

অথচ কবিতাকে সেই স্তরে অতিজীবিত করার অভিপ্রায় সুনীলের মনেপ্রাণে ছিল। তারই চেষ্টা আছে তাঁর 'একা এবং কয়েকজন' কাব্যের কবিতাগুলিতে। 'শব্দ' নিয়ে সুনীলের যে যজ্ঞ তাঁর সারা জীবনের কাব্যচর্চায় আমরা দেখেছি, তার ভিত্তি স্থাপন আছে এই কাব্যে। ফলে এই কাব্যের কবিতাগুলির শরীরে এক অদ্ভুত মাদকতা ছড়িয়ে আছে। আছে নেশা লাগার ঘোরও।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একা এবং কয়েকজন' কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রার্থনা'। এই কবিতায় কালের ভয়াবহতায় আবদ্ধ এক কবির মুক্তির প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে অপরূপ কিছু শব্দে। এখানে আছে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ হাহাকার –

'আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হবো তিমির শিকারে
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।
অথচ সময়াহত আপাত বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে
বর্তমান-ভীতু চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে।'[৪] (প্রার্থনা)

'সময়াহত' অবশ্যই যুগচেতনার ফসল। এই যুগচেতনা সুনীলের বহু কবিতার মূল ভাব। 'প্রার্থনা' কবিতায় সুনীলের ব্যক্তিজীবনও কেমন ভাবে যেন ঢুকে গেছে! হয়ত তা অবচেতন ভাবেই। কারণ তাঁর বহু কবিতায় অবচেতন ভাবে এমন কিছু এসে যায়, যা তিনি হয়ত বলতে চাননি। সুনীলের বাল্য-কৈশোরকাল গ্রাম ও শহর দু'জায়গাতেই কেটেছে। এর সুদূরপ্রসারি প্রভাব পড়েছে তাঁর সাহিত্যে। গ্রামের উদার প্রকৃতির সান্নিধ্য যেমন তিনি পেয়েছেন, সেই সঙ্গে শহরের নাগরিক জীবনের ব্যস্ততাও তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। সুনীল বলেছেন –

"কলকাতার শান বাঁধানো পথে আছাড় খেয়ে আমার মাথা ফেটেছে, আবার গ্রামের আদিগন্ত পাটখেতের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি চলে গেছি সূর্যাস্তের দিকে।"[৫]

অভিনিবেশের সঙ্গে যদি লক্ষ করি, তাহলে দেখব সুনীলের জীবনযাপনের মধ্যে বাল্য-কৈশোরের এই গ্রাম ও শহরের সম্মিলিত ধারা কিন্তু মিলছে। এই কবিতার মধ্যেও অজ্ঞাতসারেই হয়ত এই গ্রাম ও শহরের প্রচ্ছন্ন সম্মিলন দেখতে পাচ্ছি-

'ঋজু শাল অশ্বত্থের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা
সব তুমি সয়েছ', বসুধা।
স্তব্ধ নীল আকাশের দৃশ্য অন্তহীন পটভূমি
চক্ষুর সীমানা প্রান্তে বেঁধে দিয়ে তুমি
এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টিমগ্ন নদী – তার দূরাভাস তীর

আমাকে নিঃশেষে দিলে তোমার একান্ত মৃদু মাটির শরীর।'[৬] (প্রার্থনা)

কবির চোখে 'মাঠ বন বৃষ্টিমগ্ন নদী' গ্রামের দোসর হতে বাধা নেই; কিন্তু 'তার দূরাভাস তীর'- অবশ্যই শহরের ইঙ্গিত। 'মাটির শরীর'ও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হতেই পারে। মাটি কিন্তু সহনশীল, সমস্ত কিছুকে শোষণ করার শক্তি রাখে। কবির শরীরকে মাটির উপাদানে গঠিত করে গ্রাম ও শহর জীবনকে ধারণ করার ক্ষমতার কথা এসে গেছে কবিতার এই অংশে।

প্রেমভাবনার নতুন অনুভূতি আছে 'ঝর্ণা-কে' কবিতায়। এক প্রেম-পূজারি বাউলের ট্রাজেডি যেন এই কবিতাটি। এই বাউল মরেও তার প্রেমকে অদ্ভুতভাবে বাঁচিয়ে রেখে গেছে -

'সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,
আহা, ভুলে গেলাম কি তার গান!

প্রাণ দিয়েছে দেয় নি তার হাসি
গানের মতো প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা।
সেই যে তার মরণাহত হাসি
ঝর্ণা, জানো, তারই নাম তো বাঁচা।'[৭] (ঝর্ণা-কে)

'সপত্নী' কবিতায় এসেছে প্রেম ও কবিতা- এই দুইয়ের পরস্পরের মধ্যকার এক সম্পর্ক। কোনো পুরুষের জীবনে যেমন দুটি সতীন একসঙ্গে থাকলে তার বিড়ম্বনার অন্ত্য নেই; তেমনি এই কবিতাতেও সুনীল প্রেম ও কবিতাকে সমগোত্রীয় স্থানে রেখে লিখেছেন-

'তুমি কবিতার শত্রু- কবিতার মদির সৌরভ
মুহূর্তেই মুছে যায়- তুমি এলে আমার এ ঘরে
থাকে শুধু যৌবনের যন্ত্রণার তীব্র অনুভব
বৃষ্টির মতন ঝরে অন্ধকার- সমস্ত অন্তরে।'[৮] (সপত্নী)

'কবিতার শত্রু' এখানে যৌবন-উদ্দীপ্ত কবির প্রেমভাবনার প্রকাশ। যৌবনে পদার্পণ করা কবির হৃদয়ে এই প্রেমের জোয়ার এলে 'কবিতা' যেন কোথায় হারিয়ে যায়! কবির অকপট স্বীকারোক্তি-

'আমাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করে নাও তুমি এসে
সমস্ত পৃথিবী থেকে তোমার আপন পৃথিবীতে'[৯] (সপত্নী)

কিন্তু কবিতা চলে গেলেও কবি সুখি থাকেন তাঁর যৌবন-উদ্দীপ্ত প্রেমভাবনা নিয়ে। এই প্রেমভাবনা প্রেমিক কবিকে আনন্দের স্বাদে সিক্ত করে। 'নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে সাধ হয় ভালোবেসে'- এও এক ধরনের আত্মলীন চেতনা। যার পরতে পরতে মিশে রয়েছে প্রেমের প্রতি কবির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। এবার প্রেম ও কবিতা কেমন অসাধারণ চেতনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায়-

'কাব্যের স্বপত্নী তুমি, তুমি তাঁকে চাও না অন্তরে
সে তবু আমার মনে তোমারই স্বপ্নের মূর্তি গড়ে।।'[১০] (সপত্নী)

'প্রেম' থেকেই 'কবিতা' জন্ম নেয় – এই সত্য 'সপত্নী' কবিতায় উদ্ভাসিত।

এই কাব্যের ‘বিবৃতি’ কবিতায় রয়েছে এক বিধবা নারীর জীবন-ট্রাজেডির কথা। যে নারী তার উনিশ বছর বয়সেই স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হয়েছে। তারপর দীর্ঘ একাকীত্বে অসহায়া এই নারী তার দেহক্ষুধার যন্ত্রণায় কাটিয়েছে বেশ কয়েকটা বছর। তারপর একদিন জানা যায়, সেই বিধবা মেয়েটি গর্ভবতী! বাতাসে ছড়িয়ে যায় নানান সন্দেহের কানাকানি। সামাজিক লজ্জায় মেয়েটির অবস্থা এখন মরণাপন্ন।

‘উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উনতিরিশে এসে
গর্ভবতী হল, তার মোমের আলোর মত দেহ
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ
সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্ত অবশেষে
যন্ত্রণায় বন্যা এলো, অন্ধ হলো চক্ষু, দশ দিক,
এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সচতুর গোপন প্রেমিক।
... ...
বাঁচাতে পারবে না তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু
হবিষ্যান্ন পুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হল মরণসম্ভবা
আফিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা
দোষ নেই দায়ে পড়ে যদি বা ভজনা করে যীশু।।’[১১] (বিবৃতি)

এই কবিতাটি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় মঞ্জুভাষ মিত্র বলেছেন –

> “কবি তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করেছেন- বিদ্রোহ, স্বীকারোক্তি বা confession। ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিমা, দেহ ও যৌনতাকে কবিতায় স্বপ্রতিষ্ঠ করে তাকে প্রকৃত অর্থেই রক্তমাংসের করে তোলার জোরালো প্রস্তাবনা ইতিহাসচেতনা- বিশেষত উনিশ শতকের রেনেসাঁস-মর্মরিত বৃত্তে সময়ের শিকড়, খোঁজার বাসনা- এইসব মূল প্রবণতাগুলি স্বচ্ছভাবে দেখা দিয়েছে।”[১২]

এই কবিতা সম্পর্কে বিদগ্ধ মঞ্জুভাষ মিত্রের উক্ত বিশ্লেষণ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্যই কবিতায় ব্যবহৃত ‘কণ্ঠস্বর সাহসী’। কিন্তু কবিতাটির সার্বিক পর্যালোচনা করতে গেলে এর পটভূমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতাটির পটভূমি বুঝতে আমাদের একটু পিছনে যেতে হবে; চল্লিশের দশকে। এই সময় বালক সুনীল তাঁর মা মীরাদেবীর সঙ্গে কিছুকাল কাশীতে অবস্থান করেছিলেন। এখানের (কাশী) বিধবাদের করুণ দশা বালক সুনীলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

আসলে কাশীতে বিধবারা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই অসহায়া। বাংলা থেকেও হাজার হাজার বিধবাদের তখন বাবা-কাকারা কাশীতে পাঠিয়ে দায়মুক্ত হতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ- এই দুইয়ের প্রভাব পড়েছিল কাশীর বিধবাদের ওপরেও। কেননা, বাড়ি থেকে যে সামান্য টাকা আসত, তাতে গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব ছিল না। এই নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাতেন না অভিভাবকেরা! ফলে নিরুপায় হয়ে কাশীর বিধবাদের ভিক্ষা পর্যন্ত করতে হয়েছে, এমনকি অসহায় হয়ে তারা দেহব্যবসার কাজেও লিপ্ত হয়েছিল।

এদের অবস্থা সুনীলের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীতে সুনীলের বিধবা মেয়ে বিয়ে করার বাসনা (‘আমি বিয়ে করব কোনও বিধবা কিংবা কোনও মুসলমান মেয়েকে’[১৩]) কিন্তু এই ঘটনারই

প্রতিফলন বলা যায়। এই বাসনা থেকেই ‘বিবৃতি’ কবিতার ‘আড়ালে বলি, আমিই সে সচতুর গোপন প্রেমিক’-র মতো দুঃসাহসিক চরণ। এই কবিতা আসলে কবি সুনীলের ইচ্ছা পূরণের স্বপ্নের মোহাচ্ছন্নতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু কবিতা বুঝতে গেলে ব্যক্তিসুনীলকে জানা অত্যন্ত জরুরি। কেননা, সুনীলের ব্যক্তিজীবনের নানা টুকরো টুকরো ঘটনা তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। সুনীল নিজেও বলেছেন তা –

> “আমার কবিতাগুলি অতিশয় ব্যক্তিগত বা স্বীকারোক্তিমূলক। কোনো স্থির কাব্য-আদর্শ আমার নেই। নারীর ভিতরে নারী, রূপের ভিতরে বিষাদ, জলের মধ্যে জল রং, গাড়ি বারান্দার নীচে উপবাসী মানুষ, শ্রেণী বৈষম্যের বীভৎস প্রকাশ আমাকে যে-কোনো সময় বিচলিত করে- এই সব বিষয়ই কখনো প্রশ্নে, কখনো বিষাদে, কখনো ব্যাকুলতায়, চিৎকারে আমি নানারকম ভাষায় প্রাকশের চেষ্টা করি।”[১৪]

সুনীলের ব্যক্তিজীবনের এই নানা টুকরো টুকরো ঘটনা তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে- কোনোটার প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে, কোনোটার প্রচ্ছন্ন। এমনই একটি কবিতা ‘মিনতি’। কবিতারটির মূল ভাবনা প্রেম। আর এই প্রেম যে বিশেষ নারীকে কেন্দ্র করে, সেটা জানতে হলে সুনীলের ব্যক্তিজীবনে উঁকি দিতেই হয়।

দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই সুনীলের হৃদয়ে অপর্ণা নামের এক কিশোরির প্রতি প্রথম প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এই প্রেমের প্রভাব সুনীলের কবি হওয়ার পিছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা, এই অপর্ণা নামের কিশোরি কবিতা শুনতে খুব ভালোবাসতো। সুনীল তাঁর আত্মজীবনীতে জানাচ্ছেন –

> “অপর্ণা যদি খেলোয়াড়দের ভক্ত হত, আমি নিশ্চিত খেলায় মন দিতাম, যদি গায়কদের পছন্দ করত, আমি গলা সাধতাম, তাকে খুশি করার একমাত্র উপায় নতুন নতুন কবিতা মুখস্ত বলা, তাই আমার কবিতা পাঠ শুরু হল নতুন উদ্যমে।”[১৫]

যাই হোক, এই অপর্ণা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেমের কবিতা রচনায় সুনীলের কবিহৃদয়কে রসদ জুগিয়েছে।

> ‘ঝড় দিসনে, আকাশ, সেই সুন্দরীর ঘরে
> থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীরু দীপের শিখা
> আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে শুয়ে,
> একা ঘরের প্রতীক্ষিতা, আকাশ-কনীনিকা।’[১৬] (মিনতি)

কিশোরির এই প্রতীক্ষা নিশ্চিত সুনীলের জন্যই। নির্জন দুপুরে একাকি ঘরে বসে অপর্ণা অপেক্ষা করে তার প্রেমিকের। তাই সুনীল কলেজে না গিয়ে দুপুরবেলা চলে আসেন অপর্ণার ঘরের কাছে (‘কলেজে না গিয়ে ঘোর দুপুরবেলা কোথায় যাওয়া যায়? কফি হাউসে তিনটে-চারটের আগে কেউ যায় না। তখন যেতাম সেই মেয়েটির কাছে’[১৭])।

> ‘ঝড় দিসনে, আকাশ, তবু বিরহিণীর ঘরে
> আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক শুয়ে
> ঝিকমিকিয়ে উঠুক কেঁপে ভীরু দীপের শিখা
> প্রেমিক যেন নেভায় এসে একটি দ্রুত ফুঁয়ে।।’[১৮] (মিনতি)

এই ‘মিনতি’ কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘ঐতিহাসিক কাব্যসংকলন’ ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’য় (পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭৩) স্থান দিয়েছেন।

'তুমি' নামক কবিতায় এই প্রেমের আরো গাঢ়রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি।

'আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে
তোমার দু'চোখে তবু ভীরুতার হিম!
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে
ছোট এই পৃথিবীকে করেছো অসীম।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান
রাত্রিকে করেছো তাই ঝঙ্কার মুখর
তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ ঘ্রাণ
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর।'[১৯] (তুমি)

সুনীলের রুদ্ধ যৌবনে যে কিশোরি প্রেমের স্পর্ধা এনেছিল, তার সান্নিধ্যে স্পর্শের ভাষা অনুভব করা শুরু করেছিলেন তিনি। মাঝখানে জানালার গরাদ - দু'দিকে হাতে হাত রেখে রোমিও-জুলিয়েটের যেন দেশি সংস্করণ!

অপর্ণার সঙ্গে সুনীলের এই প্রথম প্রেম অবশ্য সার্থক হয়নি, অর্থাৎ এই প্রেমের পরিণতি ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হয়েছিল। এর দায় অবশ্য সুনীল নিজেই নিয়েছেন - "একদিন খুবই বিপন্ন অবস্থায় অপর্ণা আমাকে জানাল যে, আমি ডাক দিলে সে যে-কোনওদিন এক বস্ত্রে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে থাকতে রাজি আছে। আমি সেই ডাক দিতে পারিনি।"[২০]

এই কাব্যের 'শেষ প্রণয়' কবিতায় এই প্রত্যাখান সুনীল মরমি বেদনায় তুলে ধরেছেন –

'-ফিরে যাও হে রমণী, আপন আঁচল ঢেকে মুখ।
সামান্যের বাসনায় তাকে পেতে হয়ো না উন্মুখ।
সে থাক আপন দুর্গে অন্ধকার স্বেচ্ছা নির্বাসিত
তোমার আশ্বাসে যেন হরিণের মতন চকিত।'[২১] (শেষ প্রণয়)

অপর্ণার সঙ্গে এই বিচ্ছেদ সুনীলের মনে বেশ গভীর রেখাপাত করেছিল। এই কাব্যের অন্তত তিনটি কবিতায় তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। অপর্ণাকে প্রত্যাখান করে সুনীলের 'বুক জুড়ে শুধু রৌদ্র দহন'।

'তোমাকে দিয়েছি চির জীবনের বর্ষা ঋতু
এখন আমার বর্ষাতে আর নেই অধিকার
তবুও হৃদয় জলদমন্দ্রে কাঁপে যেহেতু
চোখ ঢেকে তাই মনে করি শুধু ক্ষণিক বিকার।'[২২] (বিচ্ছেদ)

অন্য আর একটি কবিতায় এই ব্যর্থ প্রেমের অন্তহীন যন্ত্রণা অপরূপ ভাষারূপ পেয়েছে -

'তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি
শুধু পাই যন্ত্রণা
তোমার শরীরে বর্ণবাহার
অথচ আমি যে পাইনে একটু কণা;
নীল যৌবন আকাশে হারাবে, তাই বুঝি এই

চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা।’[২৩] (ব্যর্থ)

আর একটি কবিতায় এই বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ এসেছে এই ভাবে -

‘ফিরে যাবো, শীত শেষে অবিশ্বাসী মরালের মতো
অন্ধকার শুভ্র হলে, ফিরে যাবো, হে সখি নিরালা,
উরসে নন্দন গন্ধ, বিন্দু বিন্দু রক্ত ইতস্তত
তোমার শিশির-স্বাদ মুখ আর দৃষ্টিপাত মালা-
ফেলে আমি চলে যাবো, নির্বাসনে, হে সখি নিরালা।’[২৪] (অনির্দিষ্ট নায়িকা)

‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের ‘একা’ কবিতার মধ্য দিয়ে জীবনের একাকীত্ব এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার মানবগাথা রচনা করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতার প্রথমাংশে রয়েছে সেই একাকীত্বের প্রসঙ্গ-

‘একা গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন
অন্ধকার চিতাকুন্ডে পা ছড়িয়ে বসো হে আরামে
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতি সময়কে করি সমর্পণ
অনন্তের হাত থেকে কিছুক্ষণ অনিত্যের নামে।’[২৫] (একা)

কিন্তু আমি কবিতাটিকে নেহাতই উক্ত বিষয়ভাবনার আলোকে দেখতে রাজি নই; তা হলে কবিতাটির প্রতি অবিচার হবে বলে অন্তত আমি মনে করি! কবিতার কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার পটভূমি কিন্তু চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ। চল্লিশের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এবং অন্ন হাহাকারের ক্লেশ সুনীলের বালক বয়সে যে-প্রভাব পড়েছিল, তা থেকে তিনি সারাজীবন বের হতে পারেননি। এই ভয়াবহ স্মৃতি তাঁর অবচেতন মনকেও ক্রমাগত তাড়া করে বেরিয়েছে। তার একটা প্রমাণই যথেষ্ট। সুনীল তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিখেছেন- “এখনও আমি ডাল-ভাত এমন চেটেপুটে খাই যে খাওয়ার শেষে থালাটা ঝকঝক করে, অনেকে ঠাট্টা করে বলে, তোমার এঁটো থালা তো না ধুলেও চলে! নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে আমি যতটুকু নিই, তার এক বিন্দু খাবারও নষ্ট করি না। সেই দুর্ভিক্ষের আমলের স্মৃতি!”[২৬]

সেই দুর্ভিক্ষের আমলের স্মৃতি সুনীল তাঁর কবিতার শরীরেও বয়ে বেরিয়েছেন-

‘কাল রাত্রে ঘুম হয় নি, একা এক দ্বিতীয় জগতে
বৃষ্টিহীন, নিষ্পাদপ, আদিগন্ত রুক্ষ তপ্ত বালি
পায়ে ঠেলে ঠেলে হেঁটে নিজের বানানো সরু পথে
ভেবেছি নিজেরই ছায়া সত্যি নয় নিষ্ঠুর হেঁয়ালি;
জীবন বা মৃত্যুও নয়, সে এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা
চোখে জ্বলছে তীক্ষ্ণ রোদ, মগজে রাত্রির কারুকাজ
বাঁচার একটাই চিন্তা তবু তার নানান আগাছা
জড়ায় প্রাণের কেন্দ্র সঙ্গী সাথী আত্মীয় সমাজ।’[২৭] (একা)

এখানে দুর্ভিক্ষের সরাসরি কোনো চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ‘বৃষ্টিহীন’, ‘তপ্তবালি’, ‘নিষ্ঠুর হেঁয়ালি’, ‘এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা’, ‘তীক্ষ্ণ রোদ’ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কি চল্লিশের অন্ন-হাহাকারের আর্তির ভাষা

নয়? আসলে 'একা' কবিতায় যুগযন্ত্রণায় গ্রস্থ এক কবিকে আমরা পাই। যাঁর মনে হয়েছে, এই বিশ্ব থেকে তিনি ক্রমাগতই দূরে সরে যাচ্ছেন, ক্রমশই একাকীত্ব তাঁকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে বাঁধছে। কিন্তু কবি সুনীল এই একাকীত্বের নিগড় থেকে মুক্তি চান; ফিরে যেতে চান মানবের মাঝে। কবিতাটির সিদ্ধি এখানেই -

'স্বস্তিহীন এই রাত্রি,- তোমরাও এসো কয়েকজন
(তোমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন দ্বিতীয় জগত ঘিরে সূর্যের মন্ডলী)
এখানে চিন্তার কুন্ডে- ভুলে যাই অসহ নির্জন
কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে এসো হে স্মৃতির কথা বলি।।'[২৮] (একা)

এ-ও সুনীলের মানবিকতার ভিন্ন এক স্তর। কিন্তু এসবই অজান্তেই; হ্যাঁ, হয়ত বা অজান্তেই সুনীলের কলম থেকে এই সমস্ত শব্দ বেরিয়ে এসেছে, যা দুর্ভিক্ষের অন্ন-হাহাকারের দ্যোতক।

সুনীল ও তাঁর সহযোগি 'কৃত্তিবাস'-গোষ্ঠীর কবিরা যা কিছু প্রচলিত, যা কিছু সুন্দর তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তাঁদের অদম্য আগ্রাসি মননধর্মীতায়। আবার যা কিছু কুৎসিত, অসুন্দর তাকেই সাদরে বরণ করে এঁরা হয়ে উঠেছিলেন সবার কাছে বোধগম্যের বাইরে। তাই সহজেই সুনীলের মননচেতনায় 'রোদ্দুর'-এর চেয়ে 'ক্লান্ত অন্ধকার' মহৎ মনে হয়! এই যে একধরনের বিপরীত narrative, তা সুনীলের কবিতাভাষ্যকে বিশেষ দৃষ্টি-আকর্ষণীয় করে তুলতে বাধ্য করে। পাঠকের দিক থেকে আকৃষ্ট হওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। এখানেই সুনীল অনন্য। এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'দুপুর' নামক কবিতাটি দৃষ্টান্তযোগ্য। এই কবিতায় কবি সুনীল 'আলো' নয়, 'অন্ধকার'-এর জয়গান গেয়েছেন অসাধারণ চিত্রকল্পের সাহায্যে।

কবিতাটির প্রথমভাগে রয়েছে কবির রোমান্টিক মনের উদ্ভাস।

'রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা
এ যেন আলোরই শস্য, দুপুরের অস্থির কুহক
অলিন্দে দাঁড়ানো মূর্তি ঢেকে দিল দু চক্ষুর সীমা
পথ চলতে থমকে গেলো অপ্রতিভ অসংখ্য যুবক।

ভিজে চুল খুলেছে সে সুকুমার, উদাস আঙুলে
স্তনের বৃন্তের কাছে উদ্বেলিত গ্রীষ্মের বাতাস
কি যেন দেখলো চেয়ে আকাশের দিকে চোখ চেয়ে
কয়েকটি যুবক মিলে একসঙ্গে নিল দীর্ঘশ্বাস।'[২৯] (দুপুর)

এরপর একজন বেকার যুবকের ক্লান্ত দেহের অনুভাষণ আমাদের সচকিত করে। কবিতাটির এই অংশের চিত্রকল্প সত্যিই চোখে আঁটকে থাকে। আমরা স্থির দৃষ্টিতে দেখি-

'একজন যুবক শুধু দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত রুক্ষ দেহে
সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো
সম্বল সামান্য মুদ্রা করতলে গুনে গুনে দেখলো সস্নেহে
এ মাসেই চাকরি হবে, হেসে উঠলো, চোখ পড়লো
                    অলিন্দের আলো।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, নির্লিপ্তের মত চেয়ে বললো মনে মনে

কিছুদূর হেঁটে গিয়ে শেষবার ফিরে দেখলো তাকে
রোদ্দুর লেগেছে তার ঢেকে রাখা যৌবনের প্রতি কোণে কোণে
এ যেন নদীর মত, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে।'[৩০] (দুপুর)

এরপর উচ্চারিত হয় কবির নিজস্ব আরাধ্য সেই সত্যভাষণ-

'এর চেয়ে রাত্রি ভালো, যুবকটি মনে মনে বললো বারবার
রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অন্ধকার।।'[৩১] (দুপুর)

এই সত্যভাষণই সুনীলের কবিতার স্মারক। 'সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো'- আমাদের চোখের সামনে ব্যক্তি সুনীল কেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অন্ধকারকে আপন করার প্রয়াস রয়েছে 'তামসিক' কবিতাতেও। চলমান জীবনের সব কিছুই তো আর সার্থক-আনন্দে উদ্বেলিত হয় না; অনেক সময় ব্যর্থতাও জীবনের মূল স্রোতে মিশে যায়। এই ব্যর্থতার চিহ্নকে ধারণ করার বিপরীতমুখী অভিপ্রায় সকলের থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু পঞ্চাশের সুনীল তাঁর গোষ্ঠী-বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক প্রবণতাবশত এই ব্যর্থতার চিহ্নকে সগর্বে বুকে ধারণ করেছেন, দু'হাতে চেপে ধরেছেন অন্ধকারকে-

'পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল
গভীরে যাও, গভীরে যাও বুকের হলাহল
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ
দেখ জ্বলছে আকাশ ভ'রে, তবু ফেরাও মুখ
গভীরে যাও গভীরে যাও দু'হাতে ধরো আঁধার
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।'[৩২] (তামসিক)

'মৌমাছির চাক ভাঙা'র দুঃসাহসিকতায় হৃদয় জুড়ে বিষ ধারণ করতে হয়েছে। ব্যক্তি সুনীলকে এই অংশে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। বেহিসেবি জীবনযাপনের কলহাস্যে কবিতার শব্দতরঙ্গ আমরা শুনতে পাই-

'তীব্র নীল বাঁচার স্বাদ, -অন্ধকার জলে
আমি হয়ত ডুবে যেতাম আলোর কৌতূহলে।

একি অবাধ হাওয়া বইছে বাসনা চঞ্চল
আলো চাই নি, হাওয়া চাই নি, বুকের হলাহল
নিচে টানছে অন্ধকার, চোখ ঢাকছে আঁধার
হয়তো শুকনো বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।।'[৩৩] (তামসিক)

এই অন্ধকার সুনীলের প্রেমভাবনার মধ্যেও এসে সদর্পে বিকশিত হয়েছে। যৌবনের দীপ্ত অহংকারে অন্ধকারের রঙ হয়ে উঠেছে নীল। 'নীল' আর 'অন্ধকার' আবার অনেক আধুনিক কবিদের মননে মৃত্যুর দ্যোতক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ব্যতিক্রমিচেতা সুনীল মনে হয় না এমন কোনো কিছুর দ্যোতনা দিতে চেয়েছেন। আসলে আগেই যে বলেছি, যা কিছু কুৎসিত, অসুন্দর বা অমঙ্গল তাকেই সাদরে বরণ করে সুনীলের কবিমানসিকতা বিপরীত ভাবনায় ভাস্বর। 'সমুদ্র এবং মধ্যবয়স' কবিতায় রয়েছে এরই অভিভাষণ-

‘সমুদ্রে সে ডুবেছিল, সমস্ত যৌবন-কাল, রত্নের সন্ধানে-
রত্ন নয়, পেয়েছে সে বুক ভরে নীল অন্ধকার
বরং সমুদ্র-স্বাদ কয়েকটি শিশির-বিন্দু ছিল তার প্রাণে
দু’চোখে নীলের নেশা, যৌবনের দৃপ্ত অহংকার।

যদিও সময় ছিল বাউলের মত তৃপ্তিহীন
পার্থিব আলোয় খুঁজে জীবনের বিস্ময়ের ভাষা
সামান্য স্বপ্নের মত, চেয়েছিল, শোধ করে মুহূর্তের ঋণ
বিষের মতন তীব্র যুবতীর স্থির ভালোবাসা।’[৩৪] (সমুদ্র এবং মধ্যবয়স)

যুবতীর ভালোবাসার তীব্রতায় বিষের উপমা নিঃসন্দেহে গভীরতার স্পর্শ এনে দেয়।

স্বল্প-ভাষণে কবিতাকে কীভাবে হৃদয়গ্রাহী করতে হয়, তা রবীন্দ্র-উত্তর পর্বের কবিদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। অতিকথন এড়িয়ে এঁরা কবিতার অন্য এক সেতু নির্মাণে সিদ্ধহস্ত। ভাব বা রস কোনো দিক দিয়েই এ-সমস্ত কবিতাগুলি অসফল বলা না। প্রেমের কবিতাতেও একই কথা প্রযোজ্য। সুনীলের ‘সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন’ কবিতাতেও আমরা স্বল্পকথনে প্রেমের সপ্তপদী রচনার সংযত প্রকাশ দেখি-

‘এত ছোট হাতে কি করে ধরেছ বিশ্ব
কি করে নিজেকে সাজালে আকাশ নীলে?
অথচ আমি যে কত দীন কত নিঃস্ব
শুধু লুকোচুরি খেলেছি কথার মিলে।

তোমার স্বপ্ন, সুখের অমরাবতী
আমার হৃদয়ে অতল অন্ধ পাতাল,
তবুও দুজনে মিলে হলো সম্প্রতি-

ফর্সা দেয়ালে শিকারী- কীটের জাল।।’[৩৫] (সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন)

সুনীলের এই প্রেম, সুখের অমরাবতী সাজানোর ঐকান্তিক ব্যাকুলতা তাঁর আজন্ম কবিতাকে নিয়ে। কবিতার টানেই সুনীলের প্রেমের এই সপ্তপদী রচনা।

‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে ব্যর্থতার চিহ্ন বয়ে বেরিয়েছেন সুনীল। তবে তাঁর এই ব্যর্থতার চিহ্ন বহন তাঁর ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থ দিক ভাবলে ভুল হবে। আসলে এই ব্যর্থতার চিহ্ন উৎকীর্ণ হয়ে আছে সমকালীন প্রেক্ষিতে। বিশেষত উত্তাল চল্লিশের পটভূমিই যেন এই ব্যর্থতার চিহ্নের প্রতিনিধি! ব্যক্তিবিশেষকে ছাড়িয়ে নির্বিশেষের অভিমুখে সুনীল তাঁর কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন অনায়াসেই। রণজিৎ গুহ জানাচ্ছেন - “মানবিকতার নৈর্ব্যক্তিক, নির্বিশেষ আদর্শগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আখ্যান-কাহিনীর সামগ্রী হয়ে ওঠে সুনীলের কবিতায়, আর ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক বিশেষও সে-আখ্যানে সংসারযাত্রার ক্ষুদ্র ও খন্ড দৈনন্দিনের পরিধি ডিঙিয়ে উৎক্রান্ত হয় মনুষ্যত্বের বৃহত্তর নিখিল মূল্যবোধে। নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত, নির্বিশেষ ও বিশেষ আদর্শ ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিকতায় যে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয় ভাবে ও ভাবনায়, তাকে রসগ্রাহী করে তোলার কাজই এখানে কবিত্বের চেষ্টা।”[৩৬]

আগেই বলেছি, এই ব্যর্থতার চিহ্নকে ধারণ করার বিপরীতমুখী অভিপ্রায় সকলের থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু পঞ্চাশের সুনীল তাঁর গোষ্ঠী-বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক প্রবণতাবশত এই ব্যর্থতার চিহ্নকে সগর্বে বুকে ধারণ করতে পেরেছেন। সুনীল নিজেও স্বীকার করেছেন- “আমার এই সব কবিতার মধ্যে বহুরকম ব্যর্থতার চিহ্ন ছড়ানো।”[৩৭] এ-প্রসঙ্গে ‘তামসিক’ কবিতার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। এই কাব্যের ‘অবিশ্বাস’ কবিতার সুনিপুন বুনন প্রতিভায় উঠে এসেছে ব্যর্থতার চিহ্নের স্বাক্ষর।

‘যদিও জীবনে অনেক মাধুরী করেছি হরণ
কৃপণ আঙুলে খুঁজেছি বাঁচার অনেক অর্থ
বারে বারে তবু অবুঝের মত বলে ওঠে মন
ব্যর্থ, ব্যর্থ।’[৩৮] (অবিশ্বাস)

উত্তাল চল্লিশের কঠিন সময়কে একদল যুবক অবহেলায়, অহংকারে তুচ্ছ করেছে, করেছে চূর্ণ। নতুন জীবনবেদ রচনার অদম্য বাসনা নিয়ে এঁরা ছুটে চলেছে ‘এক আমি’ থেকে ‘অপর আমি’র সন্ধানে। ভয়কে দুহাতে আঁকড়ে কখন যে পরাভূত করেছে, তা প্রত্যক্ষ দর্শনে এক অপার উপলব্ধি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সুনীলের এই আশ্চর্য জীবনদর্শন প্রত্যক্ষে নির্বাক বিস্ময় ছাড়া আর আমাদের তেমন কিছু অভিব্যক্তি থাকে না। রণজিৎ গুহ জানাচ্ছেন – “তাঁর জীবনদর্শনে অস্বচ্ছ বলে যেন কিছু নেই। যে-পৃথিবীকে তিনি খোলা চোখে দেখে বর্ণনা করে যাচ্ছেন শত শত কবিতায়, সেটা তাঁর ভালোবাসার দেশ। একটিও জানলা-কবাট সেখানে অর্গলিত নয়, এবং কবি যেন অতিথি-বৎসল গৃহকর্তার মতো উৎসুক আগ্রহে পাঠককে দেখাচ্ছেন কী আশ্চর্য সে দেশ! কারণ সেখানে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু ঘটছে, আর প্রতিটি ঘটনাই কবির কাছে অফুরন্ত বিস্ময়ের বিষয়।”[৩৯] ব্যর্থতাও মনে হয় যেন স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

‘কঠিন সময় তুচ্ছ করেছি হারিয়ে ছড়িয়ে
অহংকারকে অবহেলা ভরে করেছি চূর্ণ
অন্ধ বাসনা, ভয় ফিরিয়েছি দুই হাত দিয়ে
খুশির খেয়ালে স্মৃতির মৌন করেছি পূর্ণ।’[৪০] (অবিশ্বাস)

তবুও সময়ের দাবির এই ব্যর্থতার চিহ্ন বহন করতে হয়েছে কবি সুনীলকে –

‘কত শতবার স্মরণ করেছে এই যৌবন
ভেদাভেদা নেই জলের রেখায় নারীর চিত্তে
তবু কেন আজ অবুঝের মত বলে ওঠে মন
মিথ্যে, মিথ্যে?’[৪১] (অবিশ্বাস)

সুনীলের স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা কপটতা ও চপলতার বিপরীত আদর্শে গঠিত বলা চলে। সুনীল এটা মনে প্রাণে মানেন, যে-লেখক নিজের জীবনের উপলব্ধিগুলি গভীর ও অকপটভাবে ব্যক্ত করতে না পারেন, তাঁর রচনা কৃত্রিম ও চপল হতে বাধ্য। আমার মনে হয় পঞ্চাশের কবিদের কবিতায় এই কৃত্রিমতা খুব একটা পাওয়া যাবে না। কারণ এই সময়ের কবিরা সব দিক দিয়েই নিজের কণ্ঠ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরতে আগ্রহী। প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের উপলব্ধিকে অকপটভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করতে বদ্ধপরিকর এই সময়ের কবিরা। ফলে এঁদের স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায় একধরনের স্বতঃস্ফূর্তি ভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রতিটি কবিতায় তিনি নিজের পাপ-পূণ্য, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কথায় নিজের জীবনকে ভেঙে ভেঙে যেন বলে যাচ্ছেন। সুনীল নিজেও চতুরের কথা কেমন অবলীলায় বলে চলেন -

'কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী
যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা
ক্ষণিক প্রশয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা।'[৪২] (চতুরের ভূমিকা)

তথ্যসূত্র:

১। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'অর্ধেক জীবন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৯১।
২। গুহ, রণজিৎ, 'তিন আমির কথা', তালপাতা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩৫-৩৬।
৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, ভূমিকা অংশ।
৪। তদেব, পৃ. ৩।
৫। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'অর্ধেক জীবন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১৮।
৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৩।
৭। তদেব, পৃ. ৪।
৮। তদেব পৃ. ৪।
৯। তদেব পৃ. ৪।
১০। তদেব পৃ. ৫।
১১। তদেব পৃ. ৫-৬।
১২। মিত্র, মঞ্জুভাষ, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য', প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ১৬।
১৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'অর্ধেক জীবন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১৮।
১৪। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, ভূমিকা অংশ।
১৫। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'অর্ধেক জীবন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১১০।
১৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৬।
১৭। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'অর্ধেক জীবন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১২০।
১৮। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৬।

১৯। তদেব, পৃ. ১৪।
২০। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'অর্ধেক জীবন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১৯০।
২১। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ২৮।
২২। তদেব, পৃ. ১৫।
২৩। তদেব, পৃ. ২৩।
২৪। তদেব, পৃ. ৪৬।
২৫। তদেব, পৃ. ১৯।
২৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'অর্ধেক জীবন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৪৯।
২৭। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ১৯।
২৮। তদেব, পৃ. ১৯।
২৯। তদেব, পৃ. ৭।
৩০। তদেব, পৃ. ৭।
৩১। তদেব, পৃ. ৭।
৩২। তদেব, পৃ. ৮।
৩৩। তদেব, পৃ. ৮।
৩৪। তদেব, পৃ. ৩১।
৩৫। তদেব, পৃ. ১১।
৩৬। গুহ, রণজিৎ, 'তিন আমির কথা', তালপাতা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৩।
৩৭। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, ভূমিকা অংশ।
৩৮। তদেব, পৃ. ১৫।
৩৯। গুহ, রণজিৎ, 'তিন আমির কথা', তালপাতা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২১।
৪০। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ১৫।
৪১। তদেব, পৃ. ১৬।
৪২। তদেব, পৃ. ১০।